সবই 'সাকসেস' এবং সাফল্য

ইরাকে বুশের, বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার

মহিউদ্দিন আহমদ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত তিনটি টেলিভিশন বিতর্ক ইতোমধ্যে দেখেছি; শেষটি হবে ১৩ তারিখ বুধবার। বাংলাদেশ সময় তখন বৃহস্পতিবার, ১৪ অক্টোবর সকাল। আগের তিনটি হয়েছে বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায়। আশা করছি এই শেষ বিতর্কটিও দেখতে পারব।

প্রথম এবং তৃতীয় বিতর্ক দু'টি হয়েছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জর্জ বুশ এবং সিনেটর কেরির মধ্যে। দ্বিতীয় বিতর্কটি হয়েছে দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডিক চেনি এবং সিনেটর জন এডওয়ার্ডের মধ্যে। প্রথম বিতর্কটি হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশে তখন ১ অক্টোবর; দ্বিতীয়টি দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মধ্যে আমেরিকার তারিখ ৫ অক্টোবর, বাংলাদেশে ৬ অক্টোবর। আর তৃতীয়টি হলো গত ৮ অক্টোবর, বাংলাদেশে ৯ অক্টোবর সকাল ৭টায়। এই লেখাটি যখন বৃহস্পতিবার সকালে পাঠকদের কারও কারও হাতে থাকবে, তখন হয়ত সিরিজের শেষ এবং চতুর্থ বিতর্কটি টিভিতে চলছে। অনুমান করি এটিও সকাল ৭টাতেই শুরু হবে।

প্রতিটি বিতর্ক ৯০ মিনিটের হিসাবে ইতোমধ্যে দুই বিতর্কে দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রোগ্রাম নিয়ে তিন ঘণ্টা কথা বলেছেন। ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী দুইজনের ৯০ মিনিটও ধরলে, তা হবে সাড়ে চার ঘণ্টা, আর চতুর্থ বিতর্কটির সময়ও যদি যোগ করা হয় তা দাঁড়াবে ছয় ঘণ্টায়। 'কমিশন অন প্রেসিডেন্‌শিয়েল ডিবেটস্' এই বিতর্কগুলোর আয়োজন করেছে। দুই প্রার্থীর লোকজন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই বিতর্কগুলোর আইনকানুন, বিধিবিধান, খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করেছে ৩৭ পৃষ্ঠার একটি চুক্তিতে। বিতর্কের হলরুমে তাপমাত্রা কত থাকবে, তা-ও বর্ণিত আছে এই কাগজে। ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রিপাবলিকান পার্টির রিচার্ড নিক্সন এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন কেনেডির মধ্যে প্রথম টেলিভিশন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিক্সন তখন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর কেনেডি একজন সিনেটর, ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের। কেরিও ম্যাসাচুসেটসেরই একজন সিনেটর এখন। ১৯৬০-এর পর প্রতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এমন বিতর্ক অনুষ্ঠান চলে আসছে। কোথায় বিতর্ক হবে, কতক্ষণের বিতর্ক হবে, বিতর্কে কে মডারেটরের ভূমিকা পালন করবেন, প্রার্থীরা কি বসে কথা বলবেন, না দাঁড়িয়ে বলবেন; বসে কথা বললে চেয়ারটি, টেবিলটি কেমন হবে তা-ও আগে ঠিক করে নেয় দুই প্রার্থীর লোকজন।

এই ব্যাকগ্রাউন্ডেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জোট সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর ভাষণটি টেলিভিশনে ১০ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় শুনব বলে সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু হা-হতোস্মি! সন্ধ্যা ঠিক পৌনে সাতটায় বিদ্যুত চলে গেল। যে কোন অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই বিদ্যুত খাতে তিন বছরের ব্যর্থতার জন্য আর কোন উদাহরণের দরকার ছিল না। তারপরও জোট সরকারের সাফল্য একটির পর একটি শুনতে থাকলাম রেডিওতে খালেদা জিয়ার প্রায় এক ঘণ্টার বক্তৃতায়।

আর তখনি আমার মনে পড়তে থাকল, প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর দুটি বিতর্কে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি তাঁর বিতর্কটিতে একটির পর একটি 'সাক্‌সেস' দাবি করে গেছেন ইরাকে। সিনেটর কেরি আক্রমণ করেন জর্জ বুশকে এই বলে, চমল রল্রদণঢ´র্ম´দণ ষটর ধভ অরট্য ষর্ধদমর্ল ট যফটভ´ম ষধভ যণটডণ, শান্তি অর্জন করার কোন পরিকল্পনা ছাড়াই আপনি ইরাক আক্রমণ করে বসেন। জবাবে বুশ বলেন, না, না আপনি ঠিক বলেননি, ইরাকের অবস্থা এখন সাদ্দাম হোসেনের আমল থেকে অনেক ভাল। সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করে আমরা দুনিয়াটাকে নিরাপদ করে তুলেছি। আগামী জানুয়ারি মাসে ইরাকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সকল রকমের প্রস্তুতি চলছে এই লক্ষ্যে। সিনেটর কেরি আবার বলেন, ইরাকের প্রতিবেশী দেশ জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ সেদিন বলেছেন, এখন ইরাকে যে "কেওস্ এ্যান্ড এনাকী' চলছে, ইরাকে এখন যে কোন ধরনের নির্বাচনের চিন্তাই হচ্ছে উদ্ভট কথাবার্তা। তার জবাবে জর্জ বুশ আবার এমন কিছু বলেন, ইরাকে গণতন্ত্র আসবে, মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র আসবে, দুনিয়াতে সন্ত্রাস কমবে, আমেরিকাতে 'নাইন ইলেভেন'-এর মতো আর কোন সন্ত্রাস হবে না। ওখানে গণতন্ত্র আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সিনেটর কেরি প্রশ্ন তোলেন, ইরাকে ইতোমধ্যে দুই শ' বিলিয়ন ডলার (এক বিলিয়নে ছয় হাজার কোটি বাংলাদেশী টাকা) খরচ হচ্ছে এবং এর ৯০ ভাগ দিতে হচ্ছে আমেরিকার করদাতাদের। প্রতিমাসে আমেরিকার সৈন্যরা বেশি সংখ্যায় মারা যাচ্ছে। জুলাই মাসে মারা গেছে জুন মাসের চাইতে বেশি, আগস্ট মাসে মারা গেছে জুলাইয়ের চাইতে বেশি, আর সেপ্টেম্বর মাসে মারা গেছে আগস্ট মাসের চাইতে বেশি। যারা ওখানে মারা যাচ্ছে, আহত হয়েছে, তাদের শতকরা ৯০ জন আমেরিকান। জর্জ বুশ তার উত্তরও দেন এমন কিছু বলে, ইরাকে আমরা যেসব সাফল্য অর্জন করেছি ইতোমধ্যে, এখন ইরাককে ছেড়ে আসা যাবে না। আমেরিকার 'কমান্ডার ইন চীফ' হিসাবে এমনটি আমি করতেই পারি না। এমন কিছু করলে দুনিয়ার লোকজন আমাদের দুর্বল ভাববে। দ্বিতীয় বিতর্কে একজন দর্শক বুশকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি ভুল করেছেন এমন তিনটি উদাহরণ দিন। বুশের জবাব, আমি ইরাকে কোন ভুল করিনি।

দুই

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভাষণ দেন, কিন্তু কোন সংবাদ সম্মেলন করেন না। তিনি কিছু সম্পাদককে এই সেই উপলক্ষে দাওয়াত করেন। তাদের ভূরিভোজে আপ্যায়িতও করেন। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানে কি কি কথাবার্তা হলো, তা জানতে হলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত 'খবর' পড়তে হয়। তো বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা কি ধরনের সংস্থা, তা কি এদেশের লোকজনের জানতে বাকি আছে? জোট সরকারের অনুরাগী দুই সম্পাদক 'যায়যায়দিন'-এর শফিক রেহমান এবং 'নিউ এজ' ও 'হলিডে'র সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান প্রধানমন্ত্রীর ডানে-বামে বসেন, আমরা টেলিভিশনে দেখি। কিন্তু তাঁদের পত্রিকায়ও কোন বর্ণনা থাকে না প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের কথাবার্তার। এরা ৗধথর্দ ম অভতমরবর্টধমভ ইর্ড প্রণয়নের দাবি তোলেন বাইরে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কেন বছরে একটিও সংবাদ সম্মেলন করেন না, সেই প্রশ্নটি তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে করেন না। মাইটি জর্জ বুশকে প্রশ্ন করে জেরবার করে সিনেটর কেরি এবং সাধারণ দর্শকরা। আমরা দেখি তাঁদের বিতর্কে জবাবদিহিতা কারে কয়! আর তুলনা করি আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, তিন বছর আগে তিনি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, "সে সময়ে আমরা চিহ্নিত করেছিলাম সবচেয়ে বড় দু'টি সমস্যা।" প্রধানমন্ত্রী এরপর "বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা" এবং "ক্ষমতাসীনদের মদদে দেশজুড়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাসের" উল্লেখ করে সেই সময়কার দু'টি গুরুতর সমস্যাকে চিহ্নিত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতাটির লেখক হিসাবে শফিক রেহমানের নাম আলোচিত হতে শুনেছি সাংবাদিক মহলে। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মারুফ কামাল খান প্রথমে এই বক্তৃতাটির খসড়া করেন। তারপর এটি দেখানো হয় শফিক রেহমানকে। শফিক রেহমান পরে এটিকে চূড়ান্ত করে দেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মারুফ কামাল খান বছর দুই আগেও 'যায়যায়দিন'-এ কাজ করতেন। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শফিক রেহমানেরও সাফল্য এবং অর্জন আছে। তাঁর দু'টি সাফল্যের একটি হচ্ছে এই মারুফ কামাল খানকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একজন 'খলিফা' হিসাবে পাঠানো এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় নামমাত্র দামে বড় পরিমাণের জমি অর্জন।

এখানে প্রাসঙ্গিক বলে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইনকিলাব থেকে আনোয়ার জাহিদকেও তখন বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার তথ্য উপদেষ্টা পদে পাঠানো হয়েছিল ২০০০ সালে। কিন্তু ২০০১-এর অক্টোবরের নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে আনোয়ার জাহিদকে কোন রকমের অগ্রিম নোটিস না দিয়েই বরখাস্ত করেন খালেদা জিয়া এবং তাঁর জায়গায় নিয়োগ দেন রিয়াজউদ্দিন আহমদকে। ইনকিলাবীদের আনোয়ার জাহিদ এখন বেগম জিয়ার ধারেকাছেও নেই। তবে শফিক রেহমানের মারুফ কামাল খান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি তো বটেই, এই লোক কাজিম আওয়ান ছদ্মনামে এখনও মাঝেমধ্যে আওয়ামী লীগ এবং আর সব বিরোধী দলকে আক্রমণ করে নানা প্রবন্ধ লেখেন। এই গত ৩০ মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক লেখায় মারুফ কামাল খান স্বনামেই জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে দায়ী করেন। যে গুরুতর অভিযোগটি খালেদা জিয়াও কোনদিন তোলেননি।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা লেখক বক্তৃতার শুরুতেই একটি গুরুতর অসৎ কাজ করেছেন। বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা তখন দেশের এক নম্বর সমস্যা ছিল না, এক নম্বর সমস্যা ছিল সন্ত্রাস। এক নম্বর সমস্যাটিকে দুই নম্বরে এনে বক্তৃতার শুরু থেকেই সন্ত্রাস সমস্যাটিকে খাটো করা হয়েছে এবং তা পরেও তেমনই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় সন্ত্রাস দমনে সাফল্য দাবি করেছেন। আর এই দিন সকালের প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় আছে, তখন বাংলাদেশ সফররত মার্কিন ইউএসএআইডির প্রশাসক এ্যান্ড্রু ন্যাটসিওসের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার খবর। ১০ অক্টোবরের প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গের খবরটির শিরোনাম হচ্ছে "অর্থমন্ত্রীকে ইউএসএআইডি প্রশাসক/বাংলাদেশে সুশাসন, দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।" তার পর খবরটির প্রথম দু'টি বাক্য এমন, "মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির প্রশাসক এ্যান্ড্রু ন্যাটসিওস বলেছেন, বাংলাদেশে সুশাসনের অভাব, দুর্নীতির বিস্তার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে এই বিষয়গুলোর যোগসূত্র রয়েছে।"

এ্যান্ড্রু ন্যাটসিওস মার্কিন প্রশাসনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্তাব্যক্তি। বিদেশে মার্কিন সাহায্যের প্রায় সবই এই লোকের হাত দিয়েই যায়। ১০ তারিখে জোট সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে সকালে আমরা প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় মার্কিন সরকারের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার খবর পড়ি। অথচ বিকালে রেডিওতে শুনি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে একটির পর একটি সাফল্যের কথা! তা-ও এই মার্কিন কর্মকর্তা, শুধু একজন যদি এমন কথা বলতেন তাহলে তা উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু তিনি তো একমাত্র ব্যক্তি নন যে এমন কথা বলছেন। বর্তমান জোট সরকারের প্রথম থেকেই সেই যে সংখ্যালঘু নির্যাতন দিয়ে আমল শুরু হলো, এবং শুরু হলো দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের নিন্দা সমালোচনাও, তা তো এখনও অব্যাহত আছে। বরং ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর তা আরও বেড়েছে। ১০ তারিখে জোট সরকারের তিন বছর পূর্তির দিনটিতে ঢাকায় কয়েকটি মূলধারার দৈনিক পত্রিকা এই তিন বছরকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে তার চুম্বক দেখতে পাই শিরোনামগুলোতেই। এককালে খালেদা জিয়ার প্রেস উপদেষ্টা রিয়াজউদ্দিন আহমদের ইংরেজী দৈনিক 'নিউজ টুডে'তে তিন কলামের একটি শিরোনাম আছে প্রথম পৃষ্ঠায়, "কঔঋঝ চঋঈও্ এ ঈীঅইূউঋ ৗখীঋ, ুটনমর যমফফ যফণঢথণ্র হর্ণ ম ঠণ তলফতধফফণঢ" (জোট সরকারের তিনবছরে বড় বড় নির্বাচনী ওয়াদাগুলো এখনও পূরণ করা হয়নি।) তো এই একটি মাত্র শিরোনাম থেকে দেখা যায়, এই তিন বছরের সাফল্য ব্যর্থতা সম্পর্কে বেগম খালেদা জিয়ার এককালের প্রেস উপদেষ্টা এবং এখন তাঁর 'অনুরাগী' সম্পাদকের মূল্যায়নের মধ্যে বেশ ফারাক আছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ভোরের কাগজ এবং দৈনিক সংবাদে এই তিন বছর সম্পর্কে কি লিখেছে, তা এই আলোচনায় আনতে চাই না। আনলে শফিক রেহমানদের 'ব্লাড প্রেসার' বেড়ে যাবে। কিন্তু শফিক রেহমানের মতোই জোট সরকারের আর এক 'অনুগত' সম্পাদক তাঁর ইংরেজী দৈনিক 'নিউ এজ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ১০ অক্টোবর একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছেন, "কদণ্ড্দণব্র্ধঢণ মত বধঢভধথর্দ" শিরোনামে। জোট সরকারকে এই লেখায় অপ্রত্যাশিতভাবেই বন্দনা করা হয়েছে; করা হয়েছে কিছুটা নিন্দাও। তবে শফিক রেহমানের লিখিত বক্তৃতার বিপরীতে এনায়েতউল্লাহ খানের মন্তব্য প্রতিবেদনটি হচ্ছে ই থমমঢ্র্লঢহ মত ডমর্ভর্ব্র্ট্র টভঢ ডমবযটরধ্রমভ্র, এনায়েত উল্লাহ খানের ইংরেজী সাপ্তাহিক হলিডেতেও গত ১০ অক্টোবর ৭ কলামের শিরোনামটি হচ্ছে "উরহধভথ ষমফত? কদণ ষমফত ধ্র দণরণ"। স্বনামে লিখিত এই মন্তব্য প্রতিবেদনেও এনায়েত উল্লাহ খানের অভ্যাস মতোই দুর্বোধ্য ইংরেজী আছে। এই মন্তব্য প্রতিবেদনে এনায়েত উল্লাহ খান তাঁর আওয়ামী লীগ বিদ্বেষও চাপা দিয়ে রাখতে পারেননি। তবে তিনি এও লিখেছেন, "কদণ্ড্যণর্ডরণ মর্তণররমর দট্র থরটঢলর্টণঢ ঠণহমভঢ ডরধবধভটফর্ধহ টভঢ বটরথধভটফ ঠধথর্মরহ ধভ ঈটভথফটঢণ্ড্দ? বাংলাদেশে সন্ত্রাস সম্পর্কে এনায়েত উল্লাহ খানের এই মূল্যায়ন তাঁর সরকারঘনিষ্ঠ ব্যাকগ্রাউন্ড বিবেচনা করলে কঠোরই বলতে হবে। তারপর ডেইলী স্টার। ডেইলী স্টারে এই দিন প্রথম পৃষ্ঠাতেই জোট সরকারের তিন বছর পূর্তিতে দু'টি মূল্যায়ন আছে। একটির শিরোনাম, "ইফফধটভডণ ণভ্র ৩রঢ হণটর ষর্ধদ ভর্ম টভথধঠফণ্ড্লডড্ড্র" (কোন দৃশ্যমান সাফল্য ছাড়াই জোট সরকার তিন বছর শেষ করেছে।) পাশে অন্য শিরোনামটি "৩ চঋইীও্ এ উ্হীঅকঅ্ঁীখীঋ, ঐমর্শ.ীধবয্র ষর্ধদ টধফধভথ টঢবধভ" (জোট সরকারের তিন বছর, রোগাক্রান্ত প্রশাসন নিয়ে সরকার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।) এই দুটো শিরোনামের প্রতিটি শিরোনাম দুই কলামে বিস্তৃত। দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম শিরোনাম চার কলামের, লাল হরফে "প্রধান অঙ্গীকারগুলো তিন বছরেও পূরণ হয়নি। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে ৩২টি বিষয়ে শতাধিক প্রতিশ্রুতি ছিল।"

একই ঘরানার পত্রিকা দিনকাল, সংগ্রাম, আমার দেশ এবং মানবজমিনের শিরোনামগুলো ইরাকে জর্জ বুশের সাকসেস-এর মতোই। তবে দৈনিক সংগ্রাম এবং মানবজমিন থেকে আমোদপ্রিয় পাঠকদের জন্য দুটো শিরোনাম উল্লেখ করছি। দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামটি হচ্ছে, "বিরোধী দল হিসাবে আ'লীগের ব্যর্থতার তিন বছর।" আর মানবজমিনের প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় শিরোনামটি হচ্ছে, "উল্টো স্রোতে আওয়ামী লীগ"। এর নিচেই মানবজমিনের আর একটি শিরোনাম, 'হরতাল ডেকে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে।" ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, মানবজমিনে এই দিন ইলিয়াস আলীর কোন খবর বা ছবি নেই। ইলিয়াস আলী এমপিকে সিলেটে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নিয়োগ করার পর প্রায় প্রতিদিন মানবজমিনে ইলিয়াস আলী আছেন।

তিন

জোট সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়ন এই বার ইনকিলাবের দৃষ্টিতে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ২০০০ সালের ৮ এপ্রিল বিএনপি এই ইনকিলাবের বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশে কোন একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন একটি রাজনৈতিক দলের, তাও বিএনপির মতো একটি বড় রাজনৈতিক দলের নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম। ইনকিলাব মান্নান ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কেমন বিদ্বেষমূলক আক্রমণ চালিয়েছিল তখন তা প্রকাশ করেছিল 'যায়যায়দিন'। এখন অবশ্য 'যায়যায়দিন'আর ইনকিলাব 'জানী দোস্ত'। 'যায়যায়দিন'-এর প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই ইনকিলাব থেকে উদ্ধৃতি থাকবে, থাকতেই হবে। ইনকিলাব থেকে কিছু উদ্ধৃতি না দিলে 'যায়যায়দিন' যেমন সম্পূর্ণ হয় না; সম্পূর্ণ হয় না হাল আমলের ইনকিলাবও, মুফতি ফজলুল হক আমিনীর অন্তত একটি খবর বা ছবি ছাড়া।

বিএনপি কর্তৃক ঘোরতরভাবে নিন্দিত এবং ঘৃণিত হয়েও ইনকিলাবের মান্নান মালানা এবং তার ছেলে ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দিন বিএনপিপ্রেম ছাড়েনি। 'দিনকাল'-এর ক্রোধ, আক্রোশ ইনকিলাবের বিরুদ্ধে অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। কারণ ইনকিলাব বিএনপিপ্রেমে 'দিনকাল'কেও পিছনে ফেলে দিয়েছে কখনও কখনও।

তো গত ১০ অক্টোবর এহেন ইনকিলাবের প্রথম শিরোনাম, "সন্ত্রাস দমনে আংশিক সাফল্য; দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসেনি" এই মূল্যায়নই লিখেছে মোবায়েদুর রহমান। ইনকিলাবের মোবায়েদুর রহমানের নাম দেখলেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ওবায়দুর রহমানের কথা মনে পড়ে যায়। ওবায়দুর রহমান তার ক্লাসের ছাত্রীদের উদ্দেশে ফতোয়া দিয়েছে দশ-বারোদিন আগে, তাদের বোরকা পরে ক্লাসে আসতে হবে; বোরকা পরে না আসলে তারা ক্লাস করতে পারবে না। জোট সরকারের তিন বছরের 'ইসলামাইজেশন' প্রোগ্রামের সাফল্যের এটি একটি 'উৎকৃষ্ট' উদাহরণ। আর মোবায়েদুর রহমান সারা বাংলাদেশকেই বোরকা পরাতে চায়। মোবায়েদুর রহমান আর ওবায়েদুর রহমান দুই 'মোল্লা ভাই'। মান্নান মালানার দুই মুরীদ বাংলাদেশকে তালেবান সন্ত্রাসীদের দেশ বানাতে চায়।

বিএনপিপ্রেমিক ইনকিলাবে মোবায়েদুর রহমানের এটি একমাত্র ক্রিটিক্যাল মূল্যায়ন নয়। গত কয়েক দিনের ইনকিলাবের এমন আরও কয়েকটি শিরোনাম এখন উল্লেখ করি। ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার লাল হরফে প্রথম শিরোনাম, "গ্যাস সংযোগে অনিশ্চয়তা: সাড়ে তিন শ' নতুন শিল্পোদ্যোক্তা বিপাকে"। তারপর এর নিচে আর একটি ছোট শিরোনাম, "আগামী বছর গ্যাসের দৈনিক ঘাটতির পরিমাণ ৩০ কোটি ঘনফুট ছাড়িয়ে যেতে পারে।" ৩০ সেপ্টেম্বর, প্রথম শিরোনাম, লাল হরফে, চার কলামে, "বিশ্ব্যাংকের উন্নয়ন প্রতিবেদন, ঘুষ ছাড়া বাংলাদেশে ব্যবসা করা যায় না।" ৫ অক্টোবর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম শিরোনাম লাল বড় বড় হরফে সাত কলামে "শতকোটি টাকা অপচয়ের আয়োজন।" এটি অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এবং তাঁর সন্তান নাসের রহমানকে উদ্দেশ করে লেখা। পরদিন ৬ অক্টোবর প্রথম

শিরোনাম "ঢাকা-লন্ডন আনুষ্ঠানিক বৈঠক ॥ আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়নে ব্রিটেন সহযোগিতা দেবে।" ৭ অক্টোবর ইনকিলাবের প্রথম শিরোনাম "মার্কিন চাপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের তথ্য চাওয়া হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১০ অক্টোবর সন্ধ্যার বক্তৃতায় যেমন সাফল্যের দাবি করেছেন, ইনকিলাবের এই শিরোনামগুলোতে কি তা প্রতিফলিত হয়েছে? নাকি ইনকিলাব আওয়ামী লীগ ক্যাম্পে চলে যাচ্ছে বলেই এমন সব শিরোনাম করছে? অথবা আওয়ামী লীগ যাচ্ছে ইনকিলাব ক্যাম্পে? গত ১০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন এক সুধী সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন সোনারগাঁও হোটেলে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাও। পরদিন ইনকিলাবে সুধীজনের যেসব নাম দেখলাম, তাতে ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দিন এক নম্বরে। তারপর বাহাউদ্দিন 'সুধী' হলো কখন? বাহাউদ্দিন তার বউকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমানের বাসায়ও গিয়েছিল আইভি রহমানের মৃত্যুতে শোক জানাতে!!

তাই তো সন্দেহ হয় সম্পাদকরা সকলেই দাওয়াত পাবেন, এই যদি নীতি হয়, শফিক রেহমান, এনায়েত উল্লাহ খান, দিনকালের সম্পাদক কাজী সিরাজ, সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদরা কেন দাওয়াত পান না? কিন্তু দাওয়াত পায় বাহাউদ্দিন? মাজেজাটা কি?

এর আর এক অর্থ হতে পারে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে; বাহাউদ্দিন তা বুঝতে পারছে, তাই আওয়ামী লীগের প্রতি দরদও দেখাচ্ছে। আওয়ামী লীগের শক্ত উন্নীত অবস্থানের আর একটি আলামত কি এই শফিক রেহমান, এনায়েত উলাহ খান, সাদেক উল্লাহ খান, অধ্যাপক মাহবুব উল্যাহ, অধ্যাপক আফতাব আহমদদের এই তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে কোন 'রাউন্ড টেবিল' আলোচনায় এই বার দেখা গেল না; যেমন দেখা গিয়েছিল প্রথম এবং দ্বিতীয় বছর পূর্তিতে।

জোট সরকারের তিন বছরে কয়েকটি সাফল্যের একটি তো অবশ্যই তিন বিলিয়ন ডলারের ওপর 'রিজার্ভ'। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কি লাভ? আওয়ামী লীগ সরকারের শেষদিকে রিজার্ভ ছিল এক বিলিয়ন ডলার। কিন্তু মোটা চালও তো তখন ছিল প্রতিকেজি বারো তেরো টাকা। আর এখন তিন বিলিয়ন রিজার্ভ নিয়ে মোটা চাল কিনতে হচ্ছে সাধারণ বিপন্ন মানুষদের প্রতিকেজি সতেরো-আঠারো টাকায়। চালের কেজি যদি বিশ টাকায় কিনতে হয়, রিজার্ভ পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারে উঠলেও দেশের ৮০ শতাংশ মানুষের কি 'রিলিফ', 'বেনিফিট' বা উপকার তাতে?

ম্যাক্রো অর্থনীতির সাফল্য কি ধুয়ে খাবে মানুষ? যে হারে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী এগুচ্ছে, তাতে তো দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পঞ্চাশ বছর লাগবে? তখন তো লোকসংখ্যাও পঞ্চাশ কোটি হবে!

পররাষ্ট্রনীতিতে অনেক সাফল্যের কথা আছে বক্তৃতায়–তবে সঙ্গত কারণেই নেই ইস্তাম্বুলে ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রার্থী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মাত্র ১২ ভোট পাওয়ার কথা। উম্মাহর ৫৪ ভোটের মধ্যে মাত্র ১২ ভোট! অথচ দেশের মানুষকে কতভাবে বছর ধরে বলা হলো, ওআইসি মহাসচিবের পদটি বলতে গেলে বাংলাদেশের পকেটেই আছে। এমন কূটনৈতিক বিপর্যয়ের পরও সাফল্য! ইরাকে জর্জ বুশের সাকসেসের মতই!

চার

আগের দিন মুক্তাঙ্গনে মান্নান ভূঁইয়াও একটি ভাষণ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক অভিযোগের একটি ছিল, আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে একটুও সহযোগিতা করেনি। মান্নান ভূঁইয়া এমন পাকা একজন রাজনীতিবিদ, এমন কাঁচা একটি কথা বললেন কী করে? আরে আওয়ামী লীগ তখন সহযোগিতা করবে কি? আওয়ামী লীগ তো তখন পালাচ্ছে আর পালাচ্ছে, গ্রামেগঞ্জে, শহরে বন্দরে বিএনপির হাতে মার খেয়ে। তখনকার চিত্রটি কি ছিল? বিএনপি যেখানেই সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের দেখছে, তাদের মারছে; তাদের মেয়েদের ধর্ষণ করছে। তখন সাহায্য-সহযোগিতা করবে কি? সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রথমে খাড়া তো হতে হবে। তারপর কতসব মামলা, গ্রেফতার। তোফায়েল আহমেদ, সাবের হোসেন চৌধুরী, ডক্টর মহীউদ্দীন খান আলমগীরদের কথা মনে আছে মান্নান ভূঁইয়াদের? মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবিরদেরও তো জেলে নেয়া হলো তখন। আরও কতসব দেশী বিদেশী সাংবাদিক কতভাবে নির্যাতিত হলেন, জেল খাটলেন। মান্নান ভূঁইয়ারা তখন ক্ষমতায় থাকতে শহীদ মিনারকেও তো গ্রেফতার করলেন!!

সাবের হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন এক ফেরিতে 'প্লেট চুরি'র মামলাও দায়ের করা হলো। এয়ার মার্শাল জামালউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ আমলে বিমানবাহিনীপ্রধান ছিলেন। আর তার পূর্বসূরি এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ চৌধুরীর দুর্নীতি, অনিয়ম-বেনিয়মের ওপর আদিষ্ট হয়ে কিছু কাগজপত্র বোধ হয় তদন্তকারীদের দিয়েছিলেন। সুতরাং মান্নান ভূঁইয়ারা ক্ষমতায় এসে তাঁকে নিল জেলে। তাঁর অপরাধ তিনি নাকি তাকে (এয়ার মার্শালকে) পথেঘাটে, রাস্তায়-বাজারে সতত অনুসরণকারী এককালে তাঁর অতি অধস্তন এক কর্মচারীর ঘড়ি ছিনতাই করেছেন!!! এয়ার মার্শাল র‍্যাঙ্কধারী আমাদের বর্তমান বাহিনীপ্রধানরা এত গরিব জানা ছিল না।

তারপরও জাতীয়তাবাদীদের সহযোগিতা করবে আওয়ামী লীগ? সহযোগিতা করবে জামায়াতী রাজাকারদের?

প্রতিহিংসা কত চরমে পৌঁছেছে তা গত মঙ্গলবারের সকল পত্রিকায় আবার দেখলাম, জেনারেল মুস্তাফিজের 'জেনারেল' র‍্যাঙ্ক বাতিল করা হয়েছে। আগে পদ সৃষ্টি না করে লে. জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়াটি আইনসিদ্ধ হয়নি। কিন্তু এত বছর পর তাঁকে পদাবনতি দেয়াটি হয়েছে চরম বিদ্বেষ প্রকাশের উদাহরণ। তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয় না বরং আমার তো মনে হচ্ছে, তিনিই এখন একটি বড় ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছেন! গ্রেনেড হামলার ওপর তিনি আগে যেসব প্রশ্ন করেছেন এবং গত মঙ্গলবার দিন এই জনকণ্ঠেই প্রকাশিত এক লেখায় আবার করলেন, তা এই দেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার ধারণা। তার গুরুত্ব দিন দিন বাড়বে বলেই আমার বিশ্বাস।

জোট সরকারের গত তিন বছরের ওপর সবচাইতে উৎকৃষ্ট মূল্যায়নটি আমি দেখেছি গত ১০ অক্টোবরের দৈনিক সংবাদের একটি কার্টুনে। কার্টুনিস্ট কুদ্দুস এই কার্টুনে দেখাচ্ছে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিমান মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিমানটির কয়েক ফিট মাটির ভিতরে ঢুকেও গেছে; আগের দিন ৯ অক্টোবর সিলেট বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমানের ফকার বিমানটির মুখ মাটির ভেতর যেমন ঢুকে গিয়েছিল। কুদ্দুসের কার্টুনে বিমানটির গায়ে লেখা আছে "চারদলীয় এয়ারলাইন্স"। ছোটখাটো চেহারার ছেলেমানুষ কুদ্দুস। তার চিন্তাশক্তি এবং প্রতিভার তারিফ করি।

বাংলাদেশী মৌলবাদ স্বদেশে ও বিদেশে

শাহরিয়ার কবির

বিএনপির ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো সওয়ার হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহযোগী অপরাপর মৌলবাদী স্পর্ধা, সহিংসতা ও দৌরাত্ম্য এত বেড়েছে যে, খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের আমলে ২/৩টি জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের তৎপরতার কথা আমরা খবরের কাগজ পড়ে জেনেছি। '৯৯ সালের জানুয়ারিতে বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা না পড়লে হরকতুল জেহাদের বিশাল নেটওয়ার্কের কথা জানা কঠিন হতো। এরপর কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার মাঠে বোমা বসাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল হরকতুল জেহাদের আরও কিছু চাঁই, তবে দলের নেতা মুফতি হান্নান পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলেই উদীচীর সম্মেলনে, পল্টনে সিপিবির জনসভায় এবং বাংলা নববর্ষে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসবে বোমা হামলার সঙ্গে জঙ্গী মৌলবাদীদের সম্পৃক্তির কথা গোয়েন্দা বিভাগ বলেছিল, খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

২০০১ সালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিজামীরা বিএনপির ভোটে জাতীয় সংসদে সতেরোটি আসন হাতিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের দোসর আমিনীরা পেয়েছেন দুটি। এতে তাঁরা এমনই আত্মহারা হয়েছেন যে, ভেবেছেন বাংলাদেশ বুঝি জিয়াউল হকের পাকিস্তান আর মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান হয়ে গেছে। ক্ষমতায় গিয়ে শুরু করলেন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও হত্যা। সবার আগে আমাকে জেলে ঢোকালেন, তারপর এক এক করে ঢোকালেন আমার বন্ধু, সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের, বিশেষ করে যাঁদের গায়ে মৌলবাদবিরোধিতার গন্ধ রয়েছে। হত্যার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকেননি। বর্ষীয়ান জ্ঞানতাপস অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে দিয়ে শুরু, তারপর ধারাবাহিকভাবে চলেছে এই হত্যাকাণ্ড, সর্বশেষ বলি হচ্ছেন বগুড়ার নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক প্রবীণ সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

বাংলাদেশকে পাকিস্তান ভেবে মৌলবাদীরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে সরকারী-ভাবে অমুসলিম ও কাফের ঘোষণার জন্য কারবালার মাতম শুরু করেছে। গত জানুয়ারিতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় প্রকাশনা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, এরপর শুরু করেছে তাদের মসজিদের ওপর হামলা। চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী আর খুলনাতে মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা আহমদীয়া জামাতের মসজিদ দখল করে মসজিদের নামফলক মুছে উপাসনালয় লিখে দিয়েছে, লিখেছে আরও সব আপত্তিকর কথা। যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, হত্যা করছে, কারণ তারা জানে আহমদীয়ারা কখনও পাকিস্তানের শিয়াদের মতো বদলা নেবে না। মারামারি আহমদীয়াদের স্বভাবে নেই, কেতাবেও নেই, তাই তারা মৌলবাদীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানের মতো ব্লাশফেমি আইন চালুর দাবি নিজামী আগেই করেছিলেন, এবার বিএনপির এক সাংসদকে দিয়ে জাতীয় সংসদে এই বিল জমা দিয়ে রেখেছেন। সিভিল সমাজের প্রবল বিরোধিতার কারণে তখন এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি বটে, বসে আছেন গদি ছাড়ার আগে ব্লাশফেমি আর শরিয়া আইন পাস করে যাবেন।

জনপ্রিয় লেখক ও অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের অপরাধ ছিল জামায়াতীদের মুখোশ উন্মোচন করে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। এরই জন্য এবারের বইমেলা শেষ হওয়ার আগের দিন কী নৃশংসভাবেই না তাঁকে চাপাতি আর তলোয়ার দিয়ে কোপাল মৌলবাদী ঘাতকরা! তখন মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলেও তাঁকে বাঁচতে দেয়নি মৌলবাদীরা। একের পর এক ফতোয়া জারি করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তাঁর একমাত্র ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেছে। সহ্যের শেষ সীমায় চলে গিয়েছিলেন আজাদ। প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধী দলের নেত্রীকে খোলা চিঠি লিখে বলেছিলেন–'আমি বার বার খুনের হুমকি পাচ্ছি, আমার পরিবারের সদস্যদেরও বিপদে ফেলা হচ্ছে, যা কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমার পরিবারের সদস্যদের ও নিকটজনের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না, কেননা তাদের মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই; মনে হয় তারা ছুরি, চাপাতি বা আগ্নেয়াস্ত্রের নিচে বাস করছে; মনে হয় চারদিক থেকে ঘাতকেরা তাদের ঘিরে ফেলছে, কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ নেই।'

প্রধানমন্ত্রী কিছুই করেননি। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার জন্য হুমায়ুন আজাদ যাদের দায়ী করেছেন খালেদা জিয়ার গাঁটছড়া তাদেরই সঙ্গে বাঁধা।

মৌলবাদীরা ফতোয়া দিয়ে মৃত্যুদণ্ড জারি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য অধ্যাপকদের ওপর, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর–এই অধমকেও রেহাই দেয়নি। খুলনায় সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালুকে হত্যার পর ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বালুকে মৌলবাদীরা হত্যা করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনে করেন মৌলবাদীরা এরকম আরও অনেককে

হত্যা করতে পারে। এই লেখার সময় ঢাকায় জার্মান ও ফরাসী দূতাবাস যৌথভাবে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থানের ওপর ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন করছে। এতে নিশ্চয় বহির্বিশ্বে খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের ভাবমূর্তি হীরের দ্যুতি ছড়াচ্ছে না!

দেশের ভেতর মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্যে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বাংলাদেশের মাটি উর্বর বটে, তবে মৌলবাদের জন্য নয়। খালেদা জিয়াদের পানি পেয়ে নিজামীদের মৌলবাদী গাছের শেকড় দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, স্ফীত হচ্ছে সংগঠন। সিভিল প্রশাসন থেকে শুরু করে সামরিক-আধাসামরিক বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান–এমনকি পাড়ার ক্লাবে পর্যন্ত তাদের শেকড় ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষমতায় এসে বিএনপিওয়ালারা টাকা বানাচ্ছে, জামায়াতীরা সংগঠন বাড়াচ্ছে। জোট সরকার প্রশিকার মতো এনজিওদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ফ্রীজ করেছে, কাজী ফারুকদের গ্রেফতার করে মাসের পর মাস জেলে রেখেছে, পাশাপাশি সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো ইসলামী এনজিও গজাচ্ছে। জঙ্গী মৌলবাদীদের গোপন সংগঠনের সংখ্যা দুই ডজন অতিক্রম করেছে। শরিয়া আদালত বসিয়ে ১৫/১৬টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে স্বঘোষিত জঙ্গী মৌলবাদী বাংলা ভাই এখন উত্তরবঙ্গ থেকে সরে এসে সেমি-আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে, তৎপরতা এতটুকু কমেনি। এ সবই ঘটছে বেগম খালেদা জিয়ার অশেষ করুণায়।

জামায়াতে ইসলামী ও তাদের দোসরদের মৌলবাদী তৎপরতা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার ভেতর আবদ্ধ নেই। গত বছরই আমাদের এক পাকিস্তানী বন্ধু জানিয়েছেন–জেনারেল মোশারফের হাতে মার খেয়ে জামায়াতীরা তাদের হেড কোয়ার্টার পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সরিয়ে এনেছে। গত এক বছরে বিদেশে জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা কী পরিমাণে বেড়েছে ইউরোপ-আমেরিকায় না গেলে বোঝা যাবে না।

আগস্টের শেষে পাঁচ সপ্তাহের জন্য আমেরিকা ও ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম কয়েকটা সম্মেলন আর সেমিনারে অংশ নেয়ার জন্য। এর বাইরে পশ্চিমের এই দুই ক্ষমতাধর দেশের প্রশাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার যতই বলুক আমাকে তারা গ্রেফতার করেছে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অভিযোগে–আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে এই বক্তব্য তারা বিকোতে পারেনি। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, রিপোর্টার্স উইথআউট বর্ডার, ওয়ার্ল্ড এডিটরস ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিস্ট এ্যান্ড এথিক্যাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল হিস্ট্রি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মনে করে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর জোট সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদ করবার জন্য আমাকে দুই দফা কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

বাংলাদেশে মান-বাধিকার পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি যাদের উদ্বেগের কারণ তারা আমাকে কাছে পেলে কথা বলতে আগ্রহী হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। আমার আমেরিকা ও ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেই সেখানকার আহমদীয়া সম্প্রদায়, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বন্ধুরা সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গে আমার বৈঠকের আয়োজন করে রেখেছিলেন।

এসব বৈঠকের ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমেরিকায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটি এবং ইংল্যান্ডে ফরেন অফিস ও কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের কর্ম-কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক। আমি যেদিন নিউইয়র্কের মাটিতে পা রাখি তার পরদিনই ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে ২১ আগস্টের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনার খবর পৌঁছে গেছে। ঘড়ির হিসেবে বিরোধী দলের নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওপর গ্রেনেড হামলা এবং একুশ নেতাকর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বিশ্বের প্রথম প্রতিবাদ সভাটি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বক্তা হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। নিউইয়র্কে এরপর আরও তিনটি প্রতিবাদ সভা হয়েছে, জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে সর্বদলীয় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, মহাসচিব কোফি আনানকে স্মারকপত্র দেয়া হয়েছে–সব অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। বলাবাহুল্য, এই সব সমাবেশে আমার উপস্থিতি ও বক্তব্য জামায়াতে ইসলামীর তল্পিবাহকদের সমূহ উষ্মার কারণ ঘটিয়েছে।

ঢাকায় শুধু মৌলবাদীদের মুখপত্র 'ইনকিলাব' নয়, ইত্তেফাকের মতো কাগজেও জামায়াতীরা লিখেছে আমি নাকি আমেরিকায় গিয়ে বিভিন্ন সমাবেশের বক্তৃতায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছি, স্টেট ডিপার্টমেন্টকে নাকি বলেছি বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ আর অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য। এসব খবর পড়ে, বলাবাহুল্য, আমার ঢাকার বন্ধুরা আঁতকে উঠেছেন। কারণ তাঁরা জানেন বিদেশে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে হোক কিংবা অন্য কোন ফোরামে আমি কী ধরনের কথা বলি। গত বছর (২০০৩) বইমেলায় 'অবরুদ্ধ স্বদেশ থেকে প্যারোলে ইউরোপে' নামে যে বইটি বেরিয়েছে তাতে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার আলোচনার সময় আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি অধ্যাপক খালেদ হাসান, যুক্তরাষ্ট্রের আহমদীয়া জামাতের নায়েবে আমির ও মুখপাত্র জিন্দা মাহমুদ বাজওয়া এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাউথ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সেক্রেটারি জেনারেল রতন বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। পরে ঐক্য পরিষদ থেকে এ বিষয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছিল, যা নিউইয়র্কের বাংলা পত্রিকাগুলোতে এবং ঢাকায় জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন কোন কথা বলা হয়নি যা জামায়াতীরা লিখেছে। কেন তারা এসব লিখেছে জেনেছি লন্ডন এসে। নিউইয়র্কে জামায়াতীরা সভা করে আমাকে সেখানে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে! ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছে আরেক দফা গ্রেফতারের।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে প্রায় এক ঘণ্টা। নির্দিষ্টভাবে আমি যা বলেছি তার সারমর্ম হচ্ছে–জামায়াত এবং অন্যান্য মৌলবাদীর সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের কারও কারও এমন ধারণা রয়েছে যে এরা উদারনৈতিক ইসলামী দল–এ ধারণা ঠিক নয়। বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদীদের সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক কোন গোপন বিষয় নয়। জামায়াত এবং তাদের সহযোগীদের জেহাদী নেটওয়ার্ক যে পশ্চিম গোলার্ধ অবধি বিস্তৃত এ তথ্যও তাদের অজানা থাকার কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের এশীয় মিত্র পাকিস্তান ও সৌদি আরবের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে জামায়াতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে–যা আমাদের গণতন্ত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবাধিকারের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। **(অসমাপ্ত)**

স্মৃতিতে বিচারপতি ইব্রাহিম

সৈয়দ জাহাঙ্গীর

সে আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তান যাই, মূলত দেখতে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের হালহকিকত এবং সেই সুবাদে নিজের শিল্পকর্মের একটা প্রদর্শনী করতে। উদ্দেশ্য ছিল লাহোরে প্রদর্শনী করা কিন্তু সেখানে আর্টস কাউন্সিলের ব্যস্ততার কারণে ঠিক হলো প্রথমে প্রদর্শনীটা রাওয়ালপিন্ডিতে (তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী) অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুযায়ী ঐ বছরই ডিসেম্বরের ৪ তারিখ রাওয়ালপিন্ডিতে 'গর্ডন কলেজে' আমার প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিচারপতি এম ইব্রাহিম। বিচারপতি ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতটা ছিল স্মরণীয়– তিনি নিজেই এগিয়ে এসে আমাকে সহাস্য অভিবাদন জানালেন এবং বললেন, "আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি এখানে এসেছেন প্রদর্শনী করতে, আমি গর্ব অনুভব করছি; এখানকার উচ্চমহলের লোকেরা দেখুক বাঙালী শিল্পীরা কেমন ছবি আঁকে।" ঐ সময় বলতে গেলে পিন্ডিতে পাকিস্তানী কোন শিল্পী ছবি আঁকত না। চারুশিল্পের চর্চাও ছিল তাই অতি সামান্য। প্রথমত দীর্ঘদেহী, সুঠাম সুন্দর চেহারার এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব, তার ওপর বাংলায় সম্বোধন করায় আমি সত্যিই সম্মোহিত ও গর্ববোধ করেছিলাম। এর পর আরও বিস্মিত হই তাঁর ছবি দেখা এবং ছবি বিশ্লেষণ করার আগ্রহ দেখে। একটা একটা করে ছবি তিনি দেখছিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর অভিজ্ঞতার অংশীদার করে নিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরও একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বাণিজ্যমন্ত্রী হাফিজ উর রহমান। তাঁর সঙ্গেও অনেকক্ষণ তিনি আলোচনা করলেন, ছবির বিষয়বস্তু আর মাধ্যম নিয়ে। আমার বেশিরভাগ কাজই ছিল জলরঙে। দেখলাম, জলরঙের প্রতি তাঁর আকর্ষণ একটু বেশিই। একজন আইনজীবীর চিত্রকলার প্রতি এ ধরনের আগ্রহ আমাকে বিস্মিত এবং মুগ্ধ করেছিল, আজ এত বছর পরও সে কথা স্মরণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিদায়ের পূর্বে তিনি আমাকে তাঁর বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম এবং সেখানে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল, যার আলোচনা পরে করছি।

পরদিন, অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর আমাকে একটা সংবর্ধনা জানানো হয় ওখানকার ইস্ট পাকিস্তান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। শহরের কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে পেশোয়ার রোডের একটা বাড়িতে অবস্থিত একটি বড় হলঘরে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান। ইস্ট পাকিস্তান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজ উর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি ইব্রাহিমসহ ওখানে বসবাসকারী বেশ কিছু গণ্যমান্য সরকারী কর্মচারী। এখানেও বিচারপতি ইব্রাহিম ঢাকার চিত্রকলার জগত, চিত্রশিল্পী এবং চিত্রের বাজার চাহিদা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি অবাক হলাম, তিনি নিজের পেশা আইন বিষয়ে বা রাজনীতি বিষয়ে কোন আলোচনাই আমার সঙ্গে করলেন না। বিদায়ের পূর্বে আবারও আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাসায় যাবার জন্য।

দিন কয়েক পর এক বিকেলে আমি গেলাম ইব্রাহিম সাহেবের বাসায়। তিনি চা পান এবং আলাপচারিতার এক ফাঁকে আমাকে বললেন, তিনি ছবি আঁকা শিখতে চান এবং আমি যদি তাঁকে দেখিয়ে দেই। আমি আরও কিছুটা অবাক হলাম একজন আইনের লোক ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে গিয়ে শিল্পচর্চার বাসনা ব্যক্ত করায়। তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব আর প্রত্যয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে রাজি হয়ে গেলাম তাঁর ছবি আঁকার পাঠ গ্রহণে সাহায্য করতে। সময়টা সম্ভবত ছিল মার্চ-এপ্রিলের দিকে, কারণ তাঁর বাগান তখন ছিল ফুলে ফুলে ভরা এবং সম্ভবত এমন একটা সময় যখন তিনি ভাবছিলেন মন্ত্রিত্বের পদ পরিহার করতে অথবা করার জন্য পত্র দাখিল করেছিলেন, যার ফলে তাঁর হাতে ছিল অনেক অবসর সময়। ছবি আঁকার জন্য তিনি যথারীতি রং, তুলি, কাগজকলম, এমনকি একটা ইজেলও সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। তাঁর আগ্রহ আর কর্মতৎপরতায় শুরু হয়ে যায় পাঠ গ্রহণ। প্রথম দিনে তাঁকে আঁকতে বললাম একগুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা, তাঁর বাগানের ফুল। এভাবে সপ্তাহে তিন দিন করে যেতাম আমি তাঁকে ছবি আঁকার অনুশীলন দিতে। কখনও বাগানে বসে গাছের ফুল আঁকা, আবার কখনও ঘরে বসে স্টীল লাইফ সাজিয়ে ছবি আঁকা চলল নিয়মিত। ধীরে ধীরে জড়তা কাটিয়ে বেশ কিছু সুন্দর ছবি তিনি এঁকেছিলেন। এর পর কি করে যেন হঠাৎই একদিন তিনি ঢাকায় চলে আসেন, আমার ঠিক স্মরণ নেই। অবশ্য তাঁর কিছুদিন পর আমিও চলে যাই লাহোরে এবং এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমাদের মেলামেশা। তবু আজও বিচারপতি ইব্রাহিমের সুন্দর বাচনভঙ্গি আর সদা-হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, থাকবে।

ইরাককে শুষে নেয়া হচ্ছে

এনামুল হক

(শেষাংশ)

আমি কেন বুশবিরোধী হলাম : প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা অফিসার এন্ড্রু বালথাজার বাগদাদে ১০ মাস ছিলেন। এ বছরের ২৭ আগস্ট এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, আমেরিকান সমাজের উপরিস্তরের মুষ্টিমেয় লোকের অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। এই যুদ্ধে অহেতুক সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যই তিনি ঘোরতর বুশবিরোধী হয়ে গেছেন– যদিও তাঁর পরিবার মূলত রিপাবলিকান সমর্থক। বালথাজার আরও লিখেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে বুশ প্রশাসন সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়তে কিংবা সন্ত্রাসের মূল কারণগুলো দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বুশ মিথ্যাচারী

মার্কিন মেরিন কোরের এলসিপিএল শন হিউজ এ বছরের ২৮ মার্চ লিখেছেন, ইরাক থেকে দেশে ফিরে কয়েক মাস কাটানোর পর তিনি এই দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বুশ একজন মিথ্যাচারী ও জঘন্য ব্যক্তি, যিনি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কথা একবিন্দুও ভাবেন না। ১১ সেপ্টেম্বর কমিশনের কাছে শপথ গ্রহণপূর্বক বক্তব্য দিতে বুশের অস্বীকৃতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি হাস্যাস্পদে পরিণত হয়েছে বলে শন হিউজ মনে করেন। তিনি লিখেছেন : "যেসব আদর্শের জন্য আমরা লড়ি ও জীবন দেই প্যাট্রিয়ট এ্যাক্টে সেগুলো লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমাদের মিথ্যা কথা বলে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে আমি মনে করি, আমি প্রতারিত হয়েছি এবং আমার এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই।"

অমানবিক

যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ পদাতিক ডিভিশনের সৈন্য জোসেফ চেরউইনস্কি ৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে লিখেছেন যে, একদিন তিনি ইরাকী শ্রমিকদের প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন। শ্রমিকরা বস্তায় বালু ভরছিল। তাপমাত্রা ছিল কমপক্ষে ১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। চেরউইনস্কি পুরো ইউনিফর্ম পরে সেখানে বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে পানি খাচ্ছিলেন। অসহনীয় তাপ। এ অবস্থায় তিনি ইরাকী শ্রমিকদের ছায়ায় এসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে ও পানি খেতে বলেন। এভাবে তিনি তাদের ২০ মিনিট বিশ্রাম দেন। স্টাফ সার্জেন্ট এসে তাঁকে বলেন, ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের বস্তায় বালু ভরতে হবে–বলেই তিনি ইরাকীদের কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। ৩০ মিনিট পর চেরউইনস্কি সার্জেন্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ইরাকীদের আবার বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেন। কিছুক্ষণ পর সার্জেন্ট এসে আবার ওদের কাজে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। ওরা এমন পরিবেশে কাজ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু চেরউইনস্কি লিখেছেন যে, কয়েক ইরাকী সৈনিককে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, ওদের শরীর ভীষণ ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে। বেশিরভাগের শরীর এত শীর্ণ ছিল যে, তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক খাদ্য সাহায্যের ওপর কোন কমার্শিয়াল ছবি বানানো যেতে পারে।